# মুহাম্মাদী আন্দোলনের বীর সেনানী তিতুমীর

*আব্দুল হামীদ বিন শামসুদ্দীন**

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে মীরজাফরের চরম বিশ্বাসঘাতকতার ফলে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজুদ্দৌলার পরাজয়ের ফলে ভারতবর্ষ তার স্বাধীনতা হারিয়ে পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ হয়। শুরুতে বিদেশী 'ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী' ভারতবর্ষের শাসনদন্ড হাতে নিলেও পরবর্তীতে ভারতের শাসনভার সরাসরি বৃটিশ সরকারের অধীনে চলে যায়।

বৃটিশ বেনিয়ারা মুসলমানদের হাত থেকে কেবলমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতাই হরণ করেনি; বরং তাদের শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি-কালচার, ধর্মীয় মূল্যবোধ, শিল্প, কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে আগ্রাসন চালিয়ে তাদেরকে পশ্চাৎপদ জাতিতে পরিণত করেছিল। ইংরেজ সরকার ১৭৯৩ সালে বাংলা ও বিহারে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা'র প্রবর্তন করে। ফলে প্রাচীন মুসলিম জমিদাররা জমিদারী হারায়। অন্যদিকে নব্য হিন্দু বাবু জমিদারদের উদ্ভব ঘটে। তাদের ছত্রছায়ায় দালাল, গোমস্তা, পাইক, পেয়াদা ইত্যাদি গ্রাম্য টাউট-বাটপার সৃষ্টি হয়। ওদিকে ইংরেজ সরকারের সহায়তায় বৃটেন থেকে নতুনভাবে নীলকরদের আবির্ভাব ঘটে। নীলকররা নদীয়া, যশোর, ফরিদপুর, পাবনা, রংপুর, ময়মনসিংহ অঞ্চলে নীলকুঠি স্থাপন করে নির্যাতনের মুখে কৃষকদেরকে ধান চাষের বদলে নীল চাষে বাধ্য করে। নীলকর ও জমিদাররা নানাবিধ উপায়ে বাংলার কৃষককুলের উপর উৎপীড়ন চালাতে থাকে।

ইংরেজ সরকার, নীলকর, অত্যাচারী জমিদার ও তাদের সৃষ্ট বাহিনীর হাতে নির্যাতিত কৃষকগণ ধীরে ধীরে সংগঠিত হ'তে থাকে। ফলে ভারতে শুরু হয় বৃটিশবিরোধী সংগ্রামের ধারা। জাতিগত অস্তিত্ব রক্ষায় নিরীহ কৃষক সমাজের সহায়তায় মুসলিম নেতৃবৃন্দকে বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে হয়েছে। ইংরেজ বিরোধী সংগ্রামের পটভূমি রচনায় তার ভয়ংকর পরিণতিতে আহলেহাদীছ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে অপরিসীম ত্যাগ ও তিতিক্ষা স্বীকার করতে হয়েছে। পরাধীন ভারতে সিপাহী বিদ্রোহ, ওহাবী আন্দোলন, ফরায়েজী আন্দোলন, কারামাত বিদ্রোহ, ত্বরীকায়ে মুহাম্মাদী আন্দোলন, জিহাদ আন্দোলন ইত্যাদি প্রত্যেকটিতে আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দ কর্ণধার ও পথপ্রদর্শক হিসাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন, সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছেন বিভিন্নভাবে।

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ফযিলা রহমান মহিলা কলেজ, স্বরূপকাঠি, পিরোজপুর।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিতে যে ক'জন মহান বীর সেনানী ও অকুতোভয় বীর পুরুষের নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে তাদের মধ্যে শহীদ তিতুমীরের নাম প্রাতঃস্মরণীয়।

তিতুমীরের আসল নাম সৈয়দ নিছার আলী। তিতুমীর তাঁর ডাক নাম। কথিত আছে, তিনি বাল্যকালে জ্বরের মত অসুখে প্রায়ই ভুগতেন। তাঁর দাদী তাঁকে ঔষধী গাছ-গাছড়ার তিতা রস পান করাতে চাইলে, তিনি তা অবলীলাক্রমে পান করতেন। তাঁর দাদী মজা করে তাঁকে 'তিতামিয়া' বলে ডাকতেন। সেই থেকে তাঁর নাম হয়ে পড়ে তিতুমীর।[১]

মীর নিছার আলী ওরফে তিতুমীর ১৭৮৬ সালে চব্বিশ পরগনা যেলার বারাসাত মহকুমার চাঁদপুর হায়দারপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন অসীম সাহসী ও দৈহিক শক্তির অধিকারী দেশপ্রেমিক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। কুস্তী ও অস্ত্র চালনায় তৎকালে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। অল্প বয়সে তিনি ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হন এবং মুসলমানদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পুনর্জাগরণে নিজেকে উৎসর্গ করেন। ১৮২২ সালে তিতুমীর হজ্জ করতে মক্কায় যান। সেখানে ভারতে জিহাদ আন্দোলনের আমীর সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভীর নিকটে বায়'আত গ্রহণ করেন।[২]

উত্তর ভারতীয় সীমান্ত অঞ্চলে সৈয়দ আহমাদ পরিচালিত 'জিহাদ আন্দোলন' আর বাংলাদেশে তিতুমীরের 'মুহাম্মাদী আন্দোলন' আহলেহাদীছ আন্দোলনেরই নামান্তর। ঐতিহাসিকগণ অনুদারতার কারণে Propaganda স্বরূপ ভারতের সংস্কার আন্দোলন সমূহকে 'ওহাবী' ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করে। এর মূল সুর বাদক ছিলেন ইংরেজ ঐতিহাসিক উইলিয়াম হান্টার। তার রচিত 'Our Indian Muslmans' গ্রন্থ পাঠ করে এ দেশের ঐতিহাসিকগণ তার অন্ধানুসরণ করেছেন মাত্র। কিন্তু আধুনিক যুগের স্বনামধন্য গবেষক ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব তাঁর 'আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ' নামক গবেষণা গ্রন্থে বলিষ্ঠ প্রামাণিক তথ্যের ভিত্তিতে প্রমাণ করেছেন যে, সৈয়দ আহমাদের জিহাদ আন্দোলন ও ভারতের দিকে দিকে পরিচালিত সংস্কার আন্দোলন সমূহ আহলেহাদীছ আন্দোলন ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তিতুমীর যে আহলেহাদীছ আন্দোলনের একজন বীর সেনানী ছিলেন তার প্রমাণ মিলে উক্ত গ্রন্থে। যেমন- তিনি জিহাদ আন্দোলনে বাঙ্গালী কয়েদী, শহীদ ও গাযীদের তালিকায় মাওলানা সৈয়দ নিছার আলী ওরফে তিতুমীরের

১. মোঃ কুতুব উদ্দিন, তিতুমীর (ঢাকাঃ বই ঘর), পৃঃ ২; আব্দুল গফুর সিদ্দিকী, শহীদ তিতুমীর দ্রঃ।

২. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ (রাজশাহীঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারীঃ ৯৬), পৃঃ ৪১৭-১৮।

নাম উল্লেখপূর্বক সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেছেন।[৩]

সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভীর সাথে তিতুমীরের মুক্তি আন্দোলনের যে একটা যোগসূত্র ছিল এবং তার মূল সুর যে একই সূত্রে গ্রথিত ছিল, তা কম-বেশী সকল লেখকগণই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী যে সর্বভারতীয় জিহাদের পরিকল্পনা করেছিলেন, সেই পরিকল্পনায় তিতুমীরের প্রত্যক্ষ অংশ ছিল। কলিকাতার গোপন বৈঠকে সর্বভারতীয় জিহাদের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পাটনায় মুজাহিদগণের কেন্দ্রীয় রাজধানী ও প্রত্যেক প্রদেশে একটি করে প্রাদেশিক দফতর স্থাপন করা হয়। তাঁর সংগ্রামের লক্ষ্য ছিল প্রধানতঃ তিনটি। প্রথমতঃ সমাজ সংস্কার ও ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তার করা। দ্বিতীয়তঃ জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচার হ'তে গরীব জনসাধারণকে মুক্ত করা এবং তৃতীয়তঃ রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল চব্বিশ পরগনা, নদীয়া ও ফরিদপুরের কিছু এলাকা নিয়ে শোষণহীন স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা। তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিলঃ

(ক) ইসলামে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন (খ) পীর পূজা, কবর পূজা, মানত মানা এবং পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে জিহাদ করা (গ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ পালন (ঘ) হিন্দু-মুসলিম কৃষককুলের ঐক্য স্থাপন এবং (ঙ) অত্যাচারী জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হওয়া।[৪] বলা বাহুল্য তিতুমীরের বক্তব্যের মধ্যে আহলেহাদীছ আন্দোলনের মূল আদর্শই প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

এছাড়া বাংলাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের পথিকৃত মাওলানা আব্দুল্লা-হেল কাফী আল-কুরায়েশী (রহঃ) তাঁর লিখিত 'আহলেহাদীছ পরিচিতি' পুস্তকে সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভীর বাঙ্গালী শিষ্যমণ্ডলীর নামের তালিকায় মীর নিছার আলী তিতুমীরের নাম বর্ণনা করেছেন।[৫]

তিতুমীর নারকেলবাড়িয়া গ্রামে 'বাঁশের কেল্লা' স্থাপন করে ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছিলেন; একথা বাংলাদেশের মানুষের মুখে মুখে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। কিন্তু তিতুমীরের আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানা ও অনুসন্ধানের আগ্রহ বর্তমান শিক্ষিত সমাজ খুব একটা বোধ করে না। এদিক থেকে তিতুমীর খানিকটা উপেক্ষিত বলেই মনে হয়। সুখের বিষয় হ'ল, অধুনালুপ্ত 'সাপ্তাহিক বিচিত্রা' পত্রিকার (১৯৭৯, ৩০শে মার্চ, ৭ম বর্ষঃ ৩য় সংখ্যা, ঢাকা) ৪৬ থেকে ৮৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিনয় ঘোষ রচিত 'তিতুমীর' এবং প্রমোদ রঞ্জন সেনগুপ্ত রচিত 'নীল বিদ্রোহ' নামে দু'টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। উক্ত প্রবন্ধদ্বয় থেকে কিছু তথ্য বক্ষমাণ প্রবন্ধে উদ্ধৃত করতে চাই। যা ভবিষ্যত গবেষকদের জন্য সহায়ক হবে বলে মনে করি।

*৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০৩ ও ৪১৭-১৮।*
*৪. আব্বাস আলী খান, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পৃঃ ২০৭।*
*৫. আহলেহাদীছ পরিচিতি পৃঃ ৭৬।*

কলভিন লিখেছেন, নারকেলবাড়িয়ার কয়েক মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে 'চাঁদপুর' গ্রামে তিতুমীরের বাস এবং সাধারণ মুসলমান চাষীর চেয়ে একটু ভাল অবস্থার কৃষক পরিবারের সন্তান। প্রথম জীবনে তিতুমীর খুব দুঃসাহসী ছিলেন। পরবর্তীতে এক ধনিক রাজকুমারের সাথে মক্কায় যাওয়ার সুযোগ পান এবং সেখান থেকে ফিরে এসে বছর খানেক চুপচাপ থাকার পর ইসলাম ধর্ম প্রচারে ও ধর্ম সংস্কারে ব্রতী হন। কিছুদিনের মধ্যে তিনি প্রায় ৩০০/৪০০ শাগরেদ তৈরী করে ফেলেন। পোশাক ও চেহারায় সাধারণ মুসলমানদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য ছিল এবং তারা সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-ব্যবহারে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলতেন *(অনুচ্ছেদ ৬)*। তাদের এই ধর্ম সংস্কারের গুরু ছিলেন সৈয়দ আহমাদ। তাদের বক্তব্য ছিল, কোন রকমের পৌত্তলিকতাপন্থী কুসংস্কারগ্রস্ত ধর্মাচারণের সঙ্গে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই এবং এই সমস্ত কুসংস্কার প্রধানতঃ হিন্দু সমাজের দীর্ঘকাল সান্নিধ্যের ফলে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করেছে, যা বর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। সন্ধান করে জেনেছি, কলকাতা শহর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের মধ্যে অধিকাংশই উক্ত সৈয়দ আহমাদের ধর্মাদর্শের অনুগামী। হিন্দুস্থানী ও ফার্সী ভাষায় এই ধর্মাদর্শ ব্যাখ্যা করে অনেক পুস্তক-পুস্তিকা, ইশতেহার প্রচারিত হয়েছে। সাধারণ লোকের মধ্যে সৈয়দ অথবা সৈয়দপন্থী তিতুমীরের এই ধর্ম সংস্কারের আদর্শ বিশেষ জনপ্রিয় হয়নি। কারণ মহররম উৎসব, ফয়তা (মৃত মুসলমানদের আত্মার কল্যাণার্থে ভোজ্যাদি দান সহ প্রার্থনা বিশেষ), পীর পূজা ইত্যাদি বিধর্মীর আচরণ বলে নিন্দিত হ'লেও সাধারণ মুসলমানদের কাছে তার মর্ম আদৌ বোধগম্য হ'ত না। সেই কারণে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে তিতুমীরের ধর্মসংস্কারের আহ্বান বিশেষ সাড়া জাগায়নি *(অনুচ্ছেদ ৮)*।

প্রধানতঃ তিতুমীরের দলের ধর্মসংস্কার আন্দোলন স্থানীয় জনসাধারণের কাছে আবেদন-নিবেদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং তার জন্য কোন দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়েছে বলে জানিনা। স্থানীয় হিন্দু জমিদাররা যারা সাধারণতঃ কোন রকমের নতুন আদর্শ বা ভাবধারার প্রচার পসন্দ করে না, তারা একটা সুযোগ পেয়ে অর্থাৎ একদল মুসলমান তিতুমীর ধর্ম প্রচার পসন্দ করছে না দেখে উভয় দলের মধ্যে বিবাদের প্ররোচনা দিতে থাকে। তারা মনে করেছিল, বিবাদ বাধিয়ে দিলে শেষ পর্যন্ত তারাই লাভবান হবে। কিন্তু তারা এতে সফল হয়নি।

নারকেলবাড়িয়া গ্রামে তিতুমীরের দলের জমায়েত হয় এবং সেখানেই তারা তাদের প্রধান ঘাঁটি তৈরী করে। তার কারণ এই গ্রামের একজন অবস্থাপন্ন চাষী প্রিন্সিপাল রায়ত ময়েজুদ্দীন বিশ্বাস ছিলেন তিতুমীরের ভক্ত। জমিদারদের উপর আক্রমণ করার জন্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এখানে তারা মযবূত ঘাঁটি তৈরী করেন। শান্তিপ্রিয় নিরীহ একদল চাষী হঠাৎ এ রকম ইংরেজ বিরোধী অভিযানের জন্য কেমন

করে উৎসাহিত হয়ে উঠল সে কথা ভাবলে বাস্তবিকই অবাক হ'তে হয় এবং তখন এই কথাই মনে হয় যে, একজন ধর্মগুরু বা ধর্ম সংস্কারের প্রভাব জনসাধারণের উপর কতদূর ব্যাপক ও গভীর হ'তে পারে।

তিতুমীরের বিদ্রোহকালের মধ্যেই জমিদার মধ্যস্বত্বভোগী ও তাদের নায়েব, গোমস্তা, আমলা, কর্মচারী নিয়ে বেশ বড় একটা শোষক শ্রেণীর বিকাশ হয়েছিল গ্রাম্য সমাজে। তাদের প্রভুবৎ সহযোগী ছিল নীলকররা এবং তাদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষণাবেক্ষণের গুরুদায়িত্ব পালন করত বৃটিশ শাসকরা।

জমিদার, নীলকর, নায়েব, গোমস্তা, সরকার, পাইক, বরকন্দাজ, দারোগা, পুলিশ, মহাজন নিয়ে গ্রাম্য সমাজের সর্বগ্রাসী শোষক উপ-শোষক শ্রেণী ও বৃটিশ শাসক রাজদণ্ডাশ্রিতদের বিরুদ্ধেই ছিল তিতুমীরের বিদ্রোহ ও সংগ্রাম।

তিতুমীর ছিলেন সৈয়দ আহমাদ শহীদের অনুগামী 'ওহাবী' আদর্শপন্থী। ওহাবীইজম বা ওহাবীবাদ হ'ল ইসলামের মধ্যে এমন একটি ধর্মগোষ্ঠী, যারা নিজেদের মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আদেশ ও উক্তির অকৃত্রিম ধারক বাহক মনে করতেন, ইসলামী আদর্শের কঠোর সংস্কারে বিশ্বাস করতেন। ইসলামের ইতিহাসে এ রকম ধর্ম গোষ্ঠীর উদ্ভব আরব দেশে ওহাবীদের পূর্বেও ইসলামের সোনালী যুগ থেকে বিদ্যমান ছিল।

আসলে আরব দেশের আব্দুল ওয়াহ্হাব নন, আমাদের দেশের শাহ অলিউল্লাহই ইসলামের এই ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রবর্তক। শাহ অলিউল্লাহ ও আব্দুল ওয়াহ্হাব সমসাময়িক সংস্কারক ছিলেন এবং অলিউল্লাহ হয়ত হিজাযে অধ্যয়নকালে আব্দুল ওয়াহ্হাবের ধর্মগুরুদের কাছ থেকেই শিক্ষা লাভ করেছিলেন, কিন্তু এমন কোন সঠিক প্রমাণ নেই যে তাঁরা কেউ কারো দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। আব্দুল ওয়াহ্হাবের মত অলিউল্লাহও প্রায় একই ধর্মমত পোষণ করতেন এবং উভয়েই ধর্মাদর্শের দিক থেকে অকৃত্রিম মূলধর্মাবলম্বী ছিলেন। উভয়েই ইসলাম ধর্মের মনোরম বাগিচা থেকে সমস্ত আগাছা, পরগাছা, জঞ্জাল, আবর্জনা নির্মূল করার পক্ষাপাতী ছিলেন। যেমন- আব্দুল ওয়াহ্হাবের মত অলিউল্লাহও ঘোর একত্ববাদী ছিলেন এবং 'শিরক' বা বহুদেবতাবাদের সঙ্গে কোন প্রকারে সংস্পর্শ সর্বতোভাবে নিন্দনীয় ও বর্জনীয় মনে করতেন।

মোগল রাজশক্তির পতন এবং বৃটিশ রাজশক্তির প্রতিষ্ঠার পর যখন ভারতের মুসলমান সমাজের সর্বাত্মক সংকট ধর্ম, রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থনীতি ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে প্রকট হয়ে উঠল; যখন দেখা গেল যে, মুসলমানরা কেবল পীর ফকীর গাযীর পূজা নয়, ওলাবিবি থেকে সত্য পীর, মানিক পীরের পর্যন্ত পূজা করছে, অসংখ্য পীরস্থান, দরগা ইত্যাদি গজিয়ে উঠেছে; যখন দেখা গেল যে, রাষ্ট্রীয় শক্তি হাতছাড়া হওয়ার ফলে মুসলমানরা সর্বক্ষেত্রে অবহেলিত-অপমানিত ও নতুন ইংরেজ রাজ্যের শত্রু বলে বিবেচিত হচ্ছে, অথচ মুহাররম, ফয়তা ইত্যাদি উৎসব অনুষ্ঠান ঠিকই চলছে, তখন ভারতীয় অলিউল্লাহ অথবা আরবের আব্দুল ওয়াহ্হাবের মৌল ইসলাম ধর্মে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান এবং বিধর্মী কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের আওয়াজ ভারতের ঐতিহাসিক পরিবেশে অবশ্যই প্রগতিশীল ছিল। কারণ তাঁদের বাহ্য ধর্মীয় পোষাকের অন্তরালে ছিল ইংরেজ রাজ্যের বিরুদ্ধে এবং রাজছত্রাশ্রিত উপশাসক ও শোষকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আহ্বান। কাজেই অলিউল্লাহবাদ বা ওয়াহাবিবাদের আন্দোলন যে তৎকালে একটা প্রগতিশীল ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল তা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না।

শাহ অলিউল্লাহ্র সুযোগ্য পুত্র শাহ আবদুল আযীয পিতার ধর্মাদর্শের উত্তরাধিকারী হন এবং সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সৈয়দ আহমাদের ধর্মান্দোলন 'জিহাদ আন্দোলন' নামে খ্যাত। কিন্তু বৃটিশ সরকার ভুলক্রমে এই আন্দোলনকে 'ওহাবী' বলে চিহ্নিত করেছেনঃ A remarkable disciple of Aziz was Sayyid Ahmad Brelobhy, Whose movement is generally known as that of the Mujahidin (holy warriars) and is erroneausly described in the British Indian Government Records as wahhabi'. (Aziz Ahmad).

মুখ্যত শিখদের বিরুদ্ধে এবং বৃটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে সৈয়দ আহমাদের ধর্মযুদ্ধ আন্দোলনই হ'ল অলিউল্লাহ্র ইসলাম ধর্মে প্রত্যাবর্তনের প্রথম প্রত্যক্ষ সক্রিয় আন্দোলন এবং তাঁর ধর্ম সংস্কারের আদর্শকে কর্মক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করার প্রথম প্রচেষ্টা। এই মুজাহিদবৃন্দ একত্ববাদের আদর্শের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। এই আন্দোলনের ফলে ক্রমে তাঁদের মধ্যে ধর্মীয়-রাজনৈতিক সংগঠনের (রিলিজিও পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন) বিকাশ হ'তে থাকে এবং দেশব্যাপী প্রচারের জন্য নানা স্থানে কেন্দ্র স্থাপিত হয়। গ্রাম হয় সংগঠনের মূল কেন্দ্র। ভারতে ইসলাম ধর্মের ইতিহাসে এটাই হ'ল প্রথম ব্যাপক গণসংগ্রামের বা গণআন্দোলনের প্রচেষ্টা।

বাংলাদেশে (ফরিদপুর যেলা) হাজী শরীয়তুল্লাহ (১৭৬৪-১৮৪০) ও তাঁর পুত্র দুদু মিয়ার 'গণআন্দোলনে'র সঙ্গে সৈয়দ আহমাদ শহীদের 'জিহাদ আন্দোলন'-এর কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু তিতুমীরের আন্দোলন ছিল শাহ অলিউল্লাহ, আবদুল আযীয ও সৈয়দ আহমাদ শহীদের 'জিহাদ আন্দোলন'-এর ধারানুগামী এবং সে জন্য সেই আন্দোলন ছিল অনেক বেশী 'মিলিট্যান্টি' বা সংগ্রামমুখী।

তিতুমীরকে কেবল বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদ রূপে চিত্রিত করলে তাঁর বিদ্রোহ ও সংগ্রামের চরিত্রকে বিকৃত করা হয়। কারণ তিতুমীরের দলভুক্ত হাযার হাযার বিদ্রোহী মুজাহেদীনের আরো অমর কৃতির শ্রেণীরূপ সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। তারা হ'ল বারাসাত, বাশিরহাট ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বস্বান্ত দরিদ্র চাষী, প্রধানতঃ তারা খাঁটি মুসলমান। ১৯৭৩ সালেও অর্থাৎ ১৪২ বছর পরেও

তাদের বংশধরদের চেনা যায়। তাদের বংশধরদের সংখ্যা অনেক বেড়েছে, সেই সঙ্গে দারিদ্র্যও বেড়েছে। কিন্তু তিতুমীর নেই। তিতুমীরের সংগ্রাম সল্পকাল স্থায়ী হ'লেও, তার তাৎপর্য নানা দিক থেকে দীর্ঘস্থায়ী। সংগ্রামের নায়ক হিসাবে বিদ্রোহী সংগঠনের দক্ষতাও ছিল তাঁর অসাধারণ। সরকারী রিপোর্টে নারকেলবাড়িয়ার সুসংহত জামা'আতের বর্ণনায় তা একাধিকবার প্রকাশ পেয়েছে। বিদ্রোহীদের সংগ্রাম পারদর্শিতাও সরকারী দলীলপত্রে স্বীকৃত। হাতি-ঘোড়া-বজরা, সেপাই-বরকন্দাজ-বন্দুক নিয়ে নীলকর ও যেলা শাসকরা একাধিকবার তিতুমীরের মুজাহিদ বাহিনীর দ্বারা তাড়িত হয়ে প্রাণ নিয়ে পলায়ণ করেছেন।

বারাসাতের জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট আলেকজাণ্ডার ৫৬ অনুচ্ছেদ সম্বলিত বিস্তারিত বিবরণের এক জায়গায় বলেন, দায়েম কারিগর থানায় এসে শপথ করে বলল যে, কৃষ্ণদেব রায় মুসলমান প্রজাদের কাছ থেকে দাড়ির জন্য আড়াই টাকা করে ট্যাক্স আদায় করছেন এবং ট্যাক্স না দিলে জরিমানা ও নানা রকমের অত্যাচার করছেন। পারিয়াল কারিগর এসে বলল যে, তালুকদার কৃষ্ণদেব রায় তিনশ' লাঠিয়াল নিয়ে এসে মুসলমানদের মসজিদে আগুন ধরিয়ে দেয়। অতঃপর তিতুমীর সম্পর্কে ছাহেব বলল, তিতুমীর হ'ল একটি নতুন মুসলমান ধর্ম সম্প্রদায়ের লিডার। তার বয়স প্রায় পঞ্চাশ বছর।

ষোল বছর তিতুমীর কলকাতায় একজন কুস্তিগীর ছিলেন। পরে একজন জমিদারের অধীনে সর্দারের চাকরি করেন এবং এক হাঙ্গামার কারণে কারাদণ্ড ভোগ করেন। কারামুক্ত হওয়ার পর তিতুমীর মক্কা যাত্রা করেন একজন রাজকুমারের সঙ্গে। মক্কায় সৈয়দ আহমাদের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। দেশে ফিরে আসার পর তিতুমীর কিছুদিন কলকাতায় থাকেন; তারপর নারকেলবাড়িয়ার কাছে হায়দারপুরে এসে ধর্ম প্রচারে মনোযোগী হন। তিন-চার বছরের মধ্যে এই অঞ্চলে তিতুমীর খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেন। তার জীবন যাত্রার ধারার অনেক পরিবর্তন হয়, কঠোর সংযত জীবন যাপন করতে থাকেন এবং তার ধর্মাদর্শে দীক্ষা দেওয়াই হয় তাঁর প্রধান কাজ। পীর পূজা, দরগাহ তৈরী এসব কাজ ইসলাম ধর্ম বিরোধী; প্রকৃত মুসলমানের উচিত ঐসমস্ত অভ্যাস বর্জন করা ইত্যাদি ছিল তিতুমীর-এর মূল কথা।

সংগ্রাম বা প্রত্যক্ষ লড়াইয়ের কলাকৌশল সম্বন্ধে বলা যায় যে, তিতুমীর নিজে একজন অত্যন্ত সূদক্ষ সাহসী বীর যোদ্ধা ছিলেন। গোলন্দাজ ম্যাকানকে গুলি করে খতম করেন তিতুমীর নিজে এবং যেলা শাসক আলেকজাণ্ডারের কানের পাশ দিয়ে যে গুলিটা বিদ্যুৎ বেগে বেরিয়ে যায় সেটাও তিতু নিজে লক্ষ্য করে ছুঁড়েছিলেন। কেবল লাঠি-সড়কি-তলোয়ার প্রভৃতি দেশীয় হাতিয়ার নয়; বরং শত্রুর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া কয়েকটা কামান-বন্দুকের সুদক্ষ ব্যবহারও তিনি নিজে শিখেছিলেন এবং তাঁর শাগরেদদেরও শিখিয়েছিলেন। কেবলমাত্র অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের দক্ষতা নয়, তিতুমীর তাঁর শত্রু পক্ষের গোয়েন্দাদের মত নিজেদের মধ্যে গোয়েন্দা দল গঠন করেছিলেন এবং তারা ছদ্মবেশে বন্ধু সেজে একাধিকবার শত্রুদের ভুল খবরাখবর দিয়ে ফাঁদে ফেলেছে। নারকেলবাড়িয়ার 'বাঁশের কেল্লা' তিতুমীর ও তাঁর সহযোদ্ধাদের চূড়ান্ত লড়াইও অভূতপূর্ব মনে হয়।[৬]

'নীল বিদ্রোহ' প্রবন্ধে প্রমোদ রঞ্জন সেন গুপ্ত লিখেছেনঃ 'তিতুমীরের নেতৃত্বে বারাসাতের কৃষকবিদ্রোহ বাংলার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট ঘটনা। এই বিদ্রোহ একাধারে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, জমিদারদের বিরুদ্ধে এবং নীলকরদের বিরুদ্ধে এবং সরকার, নীলকর উভয় সম্প্রদায়ের জমিদার মহাজন সকলের নির্যাতন শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। এই অঞ্চলের জমিদার কৃষ্ণদেব রায় তাঁর জমিদারীর মধ্যে ওহাবী মতাবলম্বী প্রত্যেকের দাড়ির উপর আড়াই টাকা খাজনা ধার্য করলেন। স্বভাবতই কৃষকরা যখন এই 'দাড়ির খাজনা' দিতে অস্বীকার করল, তখন জমিদাররা শত শত লাঠিয়াল নিয়ে তিতুমীরের গ্রাম আক্রমণ করল। বার বার আক্রমণ করেও 'দাড়ির খাজনা' আদায় করা গেল না।

ফলে তখন তারা সরকারের নিকট সাহায্য প্রার্থী হ'ল। সরকার তিতুমীরকে ধ্বংস করার জন্য যশোরের ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজাণ্ডারকে পাঠালেন ১৮৩০ সালের ১৫ই নভেম্বর। সরকারের পক্ষে বন্দুকধারী সৈন্যবাহিনী আর তিতুমীরের শুধু তীর, বর্শা, তলোয়ার, ইট-পাটকেল, আর কাঁচা বেল। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করা গরীব গ্রামবাসীদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিতুমীরের প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে সরকারী সৈন্যরা পলায়ণ করল এবং আলেকজাণ্ডার কোনমতে প্রাণ নিয়ে পালাতে সক্ষম হ'ল।

ওহাবী সম্প্রদায়ের সকল সত্যের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিতুমীর নিজেকে স্বাধীন বাদশাহ বলে ঘোষণা করলেন। এই স্বাধীনতা ঘোষণার ফল কি হবে তা তিতুমীর ভালভাবেই জানতেন। তিনি তৈরী হ'লেন। নারকেলবাড়িয়াতে 'বাঁশের কেল্লা' প্রস্তুত হ'ল।

বড় লাট বেন্টিক আলেকজাণ্ডারের পরাজয়ের পর নদীয়ার কালেক্টরকে হুকুম দিলেন তিতুমীরকে আবার আক্রমণ করার জন্য। এক সুসজ্জিত বিরাট সরকারী বাহিনী, জমিদার বাহিনী ও নীলকর বাহিনী মিলিতভাবে তিতুমীরকে আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হ'ল। তিতুমীরও তাঁর বাহিনী নিয়ে বাঘারিয়া নামক স্থানে এসে সেখানকার পরিত্যাক্ত নীলকুঠি দখল করে শত্রুর অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিপরী লাল সরকার, যিনি ওহাবী আন্দোলনের প্রতি মোটেই সহানুভূতিশীল ছিলেন না, এই লড়াই সম্বন্ধে লিখেছেনঃ মাসুমের (তিতুমীর-এর সেনাপতি) সৈন্যগণ অন্তরালে অবস্থান করায় গুলি বর্ষণে তাদের বিশেষ কোন ক্ষতি হ'ল না। কিন্তু কালেক্টরের ক্ষতি হয়েছিল অত্যধিক।

৬. *বিনয় ঘোষ, তিতুমীর, পৃঃ ৫৬-৭৪।*

ইহা দেখে কালেকটর যুদ্ধ করার হুকুম দেন। তাদেরকে পালাতে দেখে মাসুমের সৈন্যরা চারিদিক হ'তে ভীষণ বেগে তাদেরকে আক্রমণ করে। এই আক্রমণে সাহেবের বহু লোক নিহত হয় এবং একটি হস্তী ও কয়েকটি বন্দুক মাসুমের হস্তগত হয়। কালেক্টর ও জর্জ সাহেব বজরা মাধ্যমে জলপথে দ্রুত পালায়ণ করেন। তাদের পালাতে দেখে জমিদাররাও যেদিকে পারলেন পলায়ণ করলেন।

১৮৩১ সালের ১৯ নভেম্বর আরো জাঁকজমকের সঙ্গে ইংরেজ বাহিনী তিতুমীর-এর 'বাঁশের কেল্লা' আক্রমণ করল। তারা দু'টি কামান নিয়ে এসেছিল। তা দিয়ে তারা অবিরাম গোলা বর্ষণ করতে লাগল। একটি গোলার আঘাতে তিতুমীর-এর দক্ষিণ উরু ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল এবং কিছুক্ষণ পর তিতুমীর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। কামানের গোলার বিরুদ্ধে বাঁশের কেল্লারও বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হ'ল না। ৮০০ বন্দীকে আলিপুরে নিয়ে যাওয়া হ'ল। সেখানে তাদের বিচার হ'ল। বিচারে গোলাম মাসুমের প্রাণদণ্ড হ'ল। অনেকের দীপান্তর হ'ল এবং অনেকের কারাদণ্ড হ'ল। বাঁশের কেল্লার সামনে গোলাম মাসুমের ফাঁসী হয়েছিল।[৭] সেই দিনই কমিশনার বারওয়েল সাহেবকে আলেকজাণ্ডার জানান যে, নিহতদের মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলা উচিত, বিশেষত নিহতদের মধ্যে তিতুমীরও একজন যেহেতু, কারণ তা না হ'লে বিদ্রোহীরা শহীদের সম্মানে তিতুমীরের দেহ সমাধিস্ত করবে।

দুর্বল সংগঠন নিয়ে প্রায় নিরস্ত্র অবস্থায় উন্নত আগ্নেয়াস্ত্রে সুসজ্জিত শত্রুর সঙ্গে সংগ্রামে বিদ্রোহীরা তাদের ঘোষিত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ ও ধ্বংস হয়ে গেলেও ভবিষ্যৎ কালের বৈপ্লবিক স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিত্তি রচনার দিক হ'তে এই বিদ্রোহ সার্থকতা মণ্ডিত হয়েছে। কামানের মুখে তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা উড়ে গেলেও ইহা বংশ পরম্পরায় বাঙ্গালী জনসাধারণের চিত্ত ভূমিতে ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা সংগ্রামের যে অজেয় দুর্গ রচনা করে রেখেছে, ইংরেজ শাসকরা সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে কোনদিন তার ভিত্তি টলাতে পারেনি।[৮]

২০ নভেম্বর রবিবার আলেকজাণ্ডার নারকেলবাড়িয়ার বিধ্বস্ত বাঁশের কেল্লায় গিয়ে ধ্বংসস্তুপের মধ্যে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছেন এমন কোন কাগজপত্র কিতাব ইশতেহার বা ফৎওয়া পাওয়া যায় কি-না, যার মধ্যে বৃটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে তিতুমীরের দলের কোন ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত আছে। বাঁশের কেল্লা তখন গুলি গোলার আগুনে ভস্মিভূত, কাজেই তার মধ্যে কোন কাগজপত্র, কিতাব, ফৎওয়া, ইশতেহার পাওয়া যায়নি। সেইদিন নিহতদের বাকি সমস্ত মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলার হুকুম দেন আলেকজাণ্ডার, যেহেতু আগের দিন তিতুমীর ও অন্যান্য বিদ্রোহী নেতাদের মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে।[৯]

৭. *সুপ্রকাশ রায়ের ভারতের কৃষক বিদ্রোহ, পৃঃ ২৬৯-২৮২ দ্রষ্টব্য; আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৪১৮।*
৮. *ঐ, পৃঃ ২৮১; নীল বিদ্রোহ বিচিত্রা ৭৫-৭৬ পৃঃ প্রমোদ রঞ্জন সেন গুপ্ত।*
৯. *বিনয় ঘোষ, তিতুমীর বিচিত্রা, পৃঃ ৬; বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস পৃঃ ২৩১।*

**ফলাফলঃ**

বিনয় ঘোষ একজন হিন্দু ঐতিহাসিক হ'লেও অনেক সত্য কথা ও তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন। এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে হয়। তাঁর উপস্থাপিত প্রবন্ধটি বিরাট। আমি কেবল প্রয়োজনীয় অংশগুলি উদ্ধৃত করেছি। তিতুমীরের আন্দোলনকে ঐতিহাসিকগণ আহলেহাদীছ আন্দোলন বলে স্বীকার করতে না চাইলেও গবেষকগণের বিচার বিশ্লেষণে তিতুমীরের আন্দোলন ছিল একাধারে বৃটিশ সরকার ও তাদের এদেশীয় শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম, অপরদিকে প্রচলিত কুফর ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে সংস্কার আন্দোলন, যার অন্তর্নিহিত মূল Spirit অবশ্যই আহলেহাদীছ আন্দোলন।
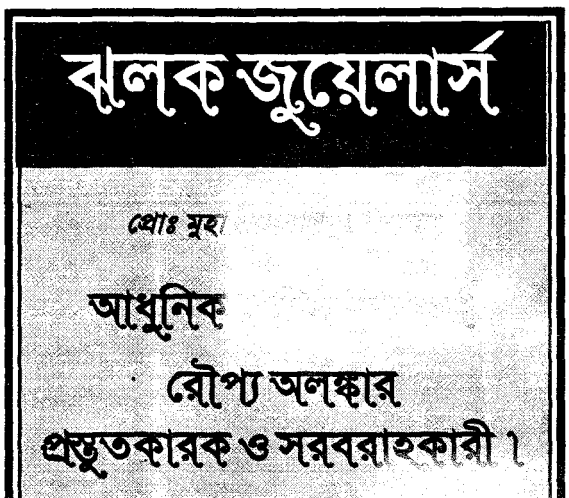
তিতুমীর ও তাঁর 'বাঁশের কেল্লা' ধ্বংস হয়েছিল সত্যিই। কিন্তু যুগ যুগ ধরে শোষিত, বঞ্চিত, স্বাধীনতাকামী তাওহীদী জনতার নিকট তাঁর ত্যাগ ও কুরবানী অনুপ্রেরণার উৎস ও মহান শিক্ষা এখনও বিরল হয়ে রয়েছে। তাঁর শাহাদত ও বাঁশের কেল্লার তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। যালেমের যুলুম ও কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে যুগে যুগে জিহাদের প্রেরণা যুগিয়েছে আহলেহাদীছ আন্দোলনের বীর সেনানী তিতুমীরের এই আপোষহীন সংগ্রামী ইস্পাত কঠিন মনোভাব ও আত্মদান। আহলেহাদীছ আন্দোলনের ভবিষ্যত প্রজন্ম তিতুমীরের জীবন কথা থেকে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করবে এই প্রত্যাশা রেখে শেষ করছি। আমীন!